দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, প্রকাশকাল আগস্ট ২০২৩

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৭২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগে সাড়াপ্রদানসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে লাগসই কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমঅধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।]

এ আরেকটি যুদ্ধ জয়ের গল্প

১. ৭০ এর ঘূর্ণিঝড় ও ৭০ এর নির্বাচন

সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ ডুবে গিয়েছিল। আকাশে মেঘ ছিল, একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিলো আর ছিল হালকা বাতাস। ভোলাসহ হাতিয়া উপকূলের মানুষ এটাকে বর্ষাকালের একটি সাধারণ রাত ভেবেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল অন্যান্য রাতের মতো। কিন্তু মধ্যরাতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কয়েক লাখ মানুষ, ঘরবাড়ি, আর গরু ছাগলকে। উপকূলের একটি বাড়িও অক্ষত ছিল না। পরদিন সকালবেলা কেবল মৃতদেহ আর বিরানভূমি।

এখন থেকে ঠিক ৫২ বছর আগের কথা। উপকূলের যারা বেঁচে গিয়েছিলেন, তারা এখনও স্মরণ করতে পারেন ভয়াল সেই দিনটির কথা। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। কলেজ ছুটির কারণে বাড়িতেই ছিলাম। আমি দেখেছি, ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ওই ঝড়ের আঘাতে হাতিয়াসহ নিঝুম দ্বীপ তছনছ হয়ে যায়। একের পর এক লোকালয় মাটির সাথে মিশে যায়। তীব্র জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেসে যায় হাজার-হাজার মানুষ, যাদের অনেকেরই আর কোন খোঁজ মেলেনি। এই অঞ্চলের ইতিহাসে ভোলা ঘূর্ণিঝড় ছিল অন্যতম মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তবে সেটি শেষ পর্যন্ত কেবল একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগই ছিল না - এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী একটি রাজনৈতিক প্রভাবও পড়েছিল কিছুদিনের মধ্যে। ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে একচেটিয়া বিজয় লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু ঘূর্ণিঝড়ের পরে হাতিয়া সফর করেন। ভোলা ও হাতিয়া উপকূলে আঘাত হানা এই সামুদ্রিক ঝড় 'দ্য গ্রেট ভোলা সাইক্লোন' নামে পরিচিতি পায়।

২. ৭০এর বন্যা ও ৬দফা: মানুষের প্রতি আমার দায়বোধ

১৯৬৯ এ আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। এর আগে কলেজে পড়তে পড়তেই বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। ঢাকা কলেজে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম লেখক শওকত ওসমান, ভাষা সংগ্রামী রওশন আরাকে। সাথে ছিল শেখ কামালসহ অন্যান্য বড় ভাইদের প্রভাব। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও যেতাম তখন। এভাবে কলেজে পড়তে পড়তেই স্বাধীনতার ভাবধারায় ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল দেশের প্রতি মানুষের প্রতি দায়বোধ, কিছু করার অদম্য ইচ্ছা। ৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ে লাশের স্তুপ, পরবর্তীতে খাবারের অভাব ও ডায়রিয়া, কলেরায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, পাকিস্তানি শাসকের বর্বরতা, বৈষম্যমূলক আচরণ আমার মতো হাজার হাজার তরুণসহ

তখনকার বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করে। ঘূর্ণিঝড়পীড়িত মানুষের জন্য কাজ করতে করতেই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে। এর আগেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চ -বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ' এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম" হয়ে গেছে। এরপর একরাতে বের হয়ে গেলাম। বন্ধুদের অনেকেই রণাঙ্গণের সাথী হতে রাজী হলো না। চার'দিন পায়ে হেঁটে, নৌকায় চড়ে পৌঁছলাম আগরতলা সীমান্তে। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপারে গিয়ে দেখা হয় তখনকার ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ, শেখ মনি, আ. স. ম আব্দুর রবসহ অনেক ছাত্রনেতার সাথে । প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি জেনারেল ওভান ও জেনারেল মালহোত্রার নেতৃত্বে। ভিয়েতনাম মডেল 'ওয়ারফেয়ার যুদ্ধ কৌশল' শেখানো হয় আমাদের। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলোতে খাবার ছিল না, ঘুমানোর জায়গা ছিল না। এমনকি খাবার পানিও অপ্রতুল ছিল। এভাবে এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষ করে আমরা প্রায় ১৭ জন গেরিলাযোদ্ধা হাতিয়ায় ফিরে আসি। শুরু হয় স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় গেরিলা যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা যাতে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য ব্রীজ, কালভার্ট ধ্বংস করেছিল মুক্তিযোদ্ধারা। তাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা বেছে নিয়েছিল জলপথ, তাদের অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ সরবরাহের জন্য। ফলে চট্টগ্রাম হয়ে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, চাঁদপুর থেকে ঢাকা তাদের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হয়ে উঠেছিল। এভাবে হাতিয়া থানা ও তার আশেপাশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল।

৩. যুদ্ধ, অতপরঃ হাতিয়াকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা

আগস্টের মাঝামাঝি ভারতের গেরিলা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রথম ১৭ জন প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে হাতিয়াতে অবস্থান নেই, একইসময় ২নং সেক্টরের অধীনে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আওতায় হাতিয়া থানা কমান্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। ১৯৭১ সালের ২৯ অক্টোবর আমার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা হাতিয়া থানায় অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর আওতায় থাকা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে প্রচুর গোলাবারুদ এবং অস্ত্র উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত অস্ত্র দিয়ে ১২০ জন স্থানীয় যুবককে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত করে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেই। ৩০ অক্টোবর ১৯৭১-এ সমগ্র হাতিয়ার সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং হাতিয়া স্কুল মাঠে ড্রামের উপর দাঁড়িয়ে হাতিয়াকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করি। ১৯৭১-এর ৬ নভেম্বর আমার নেতৃত্বে একটি চৌকস গেরিলা দল পার্শ্ববর্তী রামগতি থানা আক্রমণ করে এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭১ রামগতি থানাকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করা হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হয়।

হাতিয়াকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম

তারপর শুরু হয় আর একটি যুদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক স্বপ্ন নিয়ে শুরু করি দেশ পূনর্গঠনের কাজ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় দুর্গত এলাকায় ১০০ টির অধিক মুজিবকিল্লা এবং পুনর্বাসন পল্লী নির্মাণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলাম।

আমরা যখন হাতিয়ায় যুদ্ধের সময় অবস্থান নেই তখন একদল জাপানী রেডক্রসের কর্মী হাতিয়ায় ঘুর্ণিঝড় দুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। আমরা অস্ত্রসহ সেখানে গেলে তারা ভয়ে খাটের নিচে আশ্রয় নেয়। আমি তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারি তারা কোনো বিদেশী এজেন্ট নয় তারা রেডক্রসের কর্মী, মানুষের সেবার জন্য এসেছেন। ফলে আমি তাদের রক্ষা করি। সেই থেকে জাপানী রেডক্রসের কর্মীদের সাথে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তারা পরবর্তীতে হাতিয়া তথা দেশের পূনর্গঠনের কাজে অবদান রাখে এ বন্ধন এখনও অটুট আছে।

৪. মুক্তিযুদ্ধ শেষ, আরেকটি যুদ্ধ শুরু

১৯৭২ সালের ১০ ই জানুয়ারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরই নির্দেশে মুক্তিবাহিনী ৩১ জানুয়ারী ঢাকা স্টেডিয়ামে তাদের অস্ত্রসমূহ জমা দেয়। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে দেশ গঠনের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা অনেকেই নিজ জন্মভূমি হাতিয়াতে ফেরত আসি।

হাতিয়াতে প্রথমেই একটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার স্থাপন করি। এলাকার পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীকে উচ্চতর শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ০২ টি কলেজ নির্মাণ করাসহ ১০ টি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করি; যেগুলো এখন সরকারিভাবে নিবন্ধিত। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামত করানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেডক্রসের সহায়তায় ২০০ কি.মি.

৯০ এর সাইক্লোনে বিধ্বস্ত নিঝুম দ্বীপ

রাস্তা মেরামত করার কাজে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করি। এই কাজ করতে করতেই রেডক্রসের আমন্ত্রণে সেখানে যোগদান করি। আমি রেডক্রসের আন্তর্জাতিক টিম এর সাথে যুক্ত হই ও ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করি।

রেডক্রসে কাজ করতে করতে লক্ষ্য করি, সাইক্লোনে ক্রমাগত ত্রান সামগ্রী পাওয়ায় মানুষজন ত্রাণমুখী হয়ে ওঠে এবং কাজের প্রতি অনীহা দেখা দেয়। ত্রাণমূখী থেকে মানুষকে কাজে উদ্যোগী করার জন্য আমরা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ও উদ্যমী যুব মিলে 'সারথী' ক্লাব গঠন করি ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কাজ শুরু করি। আর ত্রাণ নয়, বিভিন্ন আয়বর্ধনমুলক ও কল্যাণমূখী কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের কাজ শুরু করি। সঞ্চয় করা, সমিতি করে বাড়ি পর্যায়ে কৃষি, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস চাষ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। ১৯৮২ সালে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা শুরুতেই ভুমিহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে। আমরা হাতিয়া, নোয়াখালীর চরাঞ্চল, ঢালচর ও নিঝুমদ্বীপে প্রায় ১২০০ ভূমিহীন পরিবারের জন্য ২৫০০ একর খাসজমি বন্দোবস্তে সহযোগিতা করি। সুপেয়, নিরাপদ পানির জন্য হাতিয়ার বিভিন্ন চরাঞ্চলে এবং নিঝুমদ্বীপে প্রায় ৩,০০০ গভীর নলকূপ স্থাপন ও ১০০০০ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করতে সক্ষম হই। বর্তমানে প্রায় ৫০,০০০ পরিবার এই সংস্থার প্রত্যক্ষ উপকারভোগী। স্বাস্থ্য-শিক্ষা, দুর্যোগ প্রশমন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু অভিযোজনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালীসহ আরও ৬টি জেলার প্রান্তিক মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

৫. ৫০ বছরের অর্জন ও সম্মাননা

১৯৭০ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সকল দুর্য্যোগ ও দুঃসময়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় জনপদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বীকৃতিস্বরুপ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা অর্জন করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সম্মাননা। যেমন- বিভাগীয় পরিবেশ রক্ষা সম্মাননা, পরিবেশবান্ধব স্থাপনা নির্মাণ সম্মাননা, মুক্তিযুদ্ধের অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সম্মাননা অর্জন করেছে। বর্তমানে ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স অফ ইউম্যানেটারিয়ান এক্টরস অব বাংলাদেশ-নাহাব এর সভাপতি, নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন, রেসপন্স এ্যান্ড প্রিপেয়ার্ডনেস এ্যাকটিভিটিজ- নিরাপদ এর সহ-সভাপতি, এডাব (এ্যাসোসিয়েসান অব ডেভলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ), এএলআরডি (এ্যাসোসিয়েসান ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট), বিডিপিসি (বাংলাদেশ ডিজেস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার), বিএনএন আরসি (বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এ্যান্ড কমিউনিকেশন), এনআইআরডিপি (নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন রেসপন্স অন ডিযাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস একটিভিটিস অন ডিজেস্টার)-সহ অনেক জাতীয় সংস্থার সাথে আমরা কাজ করছি।

৬. এখনও যেতে হবে বহুদূর

যুদ্ধ শেষেও যুদ্ধের দাহ, ক্ষত শুকানোর যুদ্ধ থাকে। নোয়াখালী জেলাসহ আর ৬টি জেলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, টেকসই, দারিদ্রমুক্ত, দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জনগোষ্ঠীর কাছে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। প্লেটো বলেছিলেন-যুদ্ধের শেষে পড়ে থাকে মানুষের অশ্রু, মানুষের রক্ত। তাই বাকি কয়েক দশক কাটে মানুষের রক্ত মুছে, অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কাজে। আমি ও দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সহকর্মীরা মিলে সেই বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কাজটিই করে যাচ্ছি।

[বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা আয়োজিত ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় এই অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। তাঁর আলোচনা সংকলন করেছেন বাসন্তি সাহা]

১৫ আগষ্ট পালন উপলক্ষে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার মাসব্যাপী কর্মসূচিতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

মুক্তির উদাত্ত বজ্র আহ্বানে
রক্ত মিছিলে বিজয়ের গানে
শোক-দগ্ধ চিরদ্রোহী প্রাণে
মনে হয় আমিই মুজিব।

সমস্ত শোকই একদিন স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু কিছু শোক একদিন শক্তিতে পরিণত হয়, মহীরুহ হয়ে ওঠে। শোক একদিন একটি পদ্মা সেতু হয়ে ওঠে, শোক একদিন ফুল-ফসলে পরিপূর্ণ শষ্যভান্ডার হয়ে ওঠে। তেমনি ১৫ আগস্ট আজ কেবল একটি শোক দিবস নয় বরং ১৫ আগস্ট আজ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ।

আমরা সবাই জানি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কাল অধ্যায়। এইদিনে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও তাঁদের শিশু সন্তান শেখ রাসেলসহ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য একদল বিপথগামী সেনাসদস্যদের হাতে নিহত হন। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এই আগস্ট ব্যাপী সংস্থার প্রধান কার্যালয়,ফাউন্ডেশন কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিসসহ সকল শাখা অফিস ও সদস্য পর্যায়ে নিম্নোক্ত কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কর্মসূচিগুলোর মধ্যে রয়েছে সংস্থার প্রতিটি সদস্য ও কর্মীদের ৫টি করে গাছ লাগালোর মাধ্যমে ১ লক্ষ বৃক্ষরোপন; মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান, ১৫ আগস্ট সংস্থার সকল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, মনপুরা ও চাটখিল উপজেলার ২টি এতিমখানায় শিশুদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা ও নোয়াখালী জেলার চানন্দী ও ধানসিঁড়ি ইউনিয়নে সুবিধাবঞ্চিতদের চোখের ছানি অপারেশনের জন্য ক্যাম্প আয়োজন।

এছাড়া ৪ আগষ্ট ২০২৩ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭৪ তম

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ১৫ আগষ্ট পালন

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার "কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে" প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার "কৈশোর কর্মসূচির" আওতায় কিশোর- কিশোরীদের মাঝে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রসঙ্গে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রফিকুল আলম বলেন, বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'তোরা গ্রামে ফিরে যা'। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ শেষে অস্ত্র জমা দিয়ে নিজের গ্রাম হাতিয়ায় ফিরে গিয়েছিলাম। তারপর আজ ৫০বছরের বেশি সময় পরেও দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগী হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা মনে করে দেশের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দেয়া ও আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুন্দর ও সবুজ পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

চাটখিল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা

১৫ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শাহদাত বার্ষিকী উপলক্ষে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ১ লক্ষ বৃক্ষ রোপণ অভিযানের সাথে একাত্ম হয়ে ২১ আগষ্ট প্রায় শতাধিক গাছের চারা নিয়ে স্বত:স্ফুর্তভাবে সামিল হল নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইমরানুল হক ভূঁইয়া। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত এ সংগঠন গত ৫০ ধরে এ অঞ্চলের মানুষের সেবা করছে। এবারের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিও বৈশ্বিক উষ্ণতা কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ কমাতে ভূমিকা রাখবে। তিনি সদস্যদের নিজেদের উদ্যোগে গাছ লাগাতে উৎসাহিত করেন।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ৩৯তম সাধারণ পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত

২০২৩-২৪ অর্থবছরের কৌশলগত পরিকল্পনা, গঠনতন্ত্র সংশোধন ও ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবসের মাসব্যাপী কর্মসূচি পালনের ঘোষণাকে সামনে রেখে গত ৬ আগস্ট ২০২৩ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার (ডিইউএস) ৩৯তম সাধারণ পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সেতু, আদাবর -৮ এর কনফারেন্স হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিইউএস- এর চেয়ারম্যান এ.এইচ.এম বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সব সদস্য, সাধারণ পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলি ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের দুইজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংস্থার আবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমরা প্রতিটি ইউনিয়নে ক্লাব গঠনের মাধ্যমে যুব নারী -পুরুষ ও কিশোর-কিশোরীদের মেধা, মননে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে আমারা এই আগস্ট মাসে আমাদের কর্মএলাকায় এক লক্ষ একটি গাছ রোপণ করার পরিকল্পনা করেছি। এছাড়া এ বছর ২০০ জনের চোখের ছানি আপারেশনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। বিভিন্ন পর্যায়ের ৪১ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছি। ভবিষ্যতে যা আরো বাড়ানোর ইচ্ছে পোষণ করছি। সভায় সংস্থার সহ-সভাপতি এ কে এম গোলাম রব্বানী একটি বকুল গাছ

বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সংস্থার কর্মী ফারজানা হায়াত বৃষ্টির হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে এই মাসের বৃক্ষ রোপন অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া নটরডেম কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র ইয়াসিন আরাফাতের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে শিক্ষাবৃত্তির প্রতীকি চেক তুলে দেন এ.এইচ.এম বজলুর রহমান, চেয়ারম্যান, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা।

ডেঙ্গু ও পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে গণসচেতনতা মূলক পথসভা

প্রতিবছর ১৪ হাজারের বেশি শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। এছাড়া বর্ষায় ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করেছে। বিশেষকরে শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে বেশি এই রোগে। এই মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য। কেবল অবহেলা আর অসাবধানে এই মৃত্যু।

পথসভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এ বছর ১৮ আগষ্ট পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ১৬৭ জন মারা গেলেন। হাসপাতালে ভর্তি আছেন প্রায় তিনহাজার মানুষ। এ বছর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মোট ৩০ হাজার ৬৮৫ জন।

বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করানো ও প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির জন্য গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ডেঙ্গু ও পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে গনসচেতনতা মূলক পথসভার আয়োজন করে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়নে এই পত্রসভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এই পথসভায় স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটি রেডিও'র ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রনয়নের জন্য মতবিনিময় সভা

টেকসই উন্নয়ন ধারায় প্রান্তিক মানুষকে সম্পৃক্ত করতে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা, সরকারি সেবাসমূহের তথ্য প্রান্তের জনগণের কাছে পৌঁছানো ও রেডিও'র ভবিষ্যৎ

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

রূপরেখা প্রনয়নের জন্য গত ২২ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ০৭টায় ধানমন্ডি, ঢাকায় দেশের ১৮টি কমিউনিটি রেডিও ও কৃষি রেডিও এর প্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব কবির বিন আনোয়ার, অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও কমিউনিটি রেডিও এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক কমিউনিটি রেডিও এর প্রতিনিধিদের সাথে মূখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব কবির বিন আনোয়ার বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য কৃষিখাতে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকার প্রায় ৬০ থেকে ৭০ভাগ ভতুর্কি দেয়। এর ফলে শস্য উৎপাদন বেড়েছে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন ভাতা ও সেবাসমূহ কীভাবে দেশের প্রতিটি জনগণ ঘরে বসে পেতে পারে তা রেডিও এর মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিতে তিনি রেডিও এর প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলমসহ ১৯ টি রেডিও এর প্রতিনিধি।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার, অন্তরা তালুকদার
প্রকাশনায় : দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা,
প্রধান কার্যালয় : ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ই-মেইল : dus.eddus@gmail.com , dusdhaka@gmail.com
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১০৩৬২

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : পাপিয়া সুলতানা, তাছনিম বিনতে মুখলিছ, সাজনীন সিফাত
আঞ্চলিক কার্যালয় : শান্তি নিবাস, দেলোয়ার কমিশনার রোড, সোনাপুর, সদর নোয়াখালী
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬৩২৩৫
ফাউন্ডেশন অফিস : ছৈয়দিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮০৮৫

প্রতিবছর ১৪ হাজারের বেশি শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। এই মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য।
আসুন সবাই মিলে শিশুর নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করি।

[প্রথম পাতার ছবিটি দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ফাউন্ডেশন কার্যালয় হাতিয়ার পুকুরে ফোঁটা শাপলার]